:: রবীন্দ্রনাথ, সমকালীন অন্যান্য কবি এবং অজিত দত্ত ::

মধুসূদন দত্ত ও বিহারীলাল চক্রবর্তীকে স্মরণে রেখেও আমরা বলতে পারি বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্তী প্রায় সোয়া-দুশো বছরের কাব্য ও সাহিত্যের, বিশেষভাবে বাংলা কাব্যের আধুনিক দিক্ নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদন বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগীয় প্রথা ও সংস্কারের বেড়া ভেঙে আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছেন। অন্যদিকে কবিতাকে বাইরের বা বস্তুতন্ময়তা থেকে ভিতরের বা আত্মতন্ময়তার দিকে ফিরিয়ে আনলেন বিহারীলাল। কিন্তু ছন্দে, মিল বা উপমায়, চিত্রকল্পে, প্রকরণে, দর্শনে, ভাব ও লাবণ্যে বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনাথের হাতে তার নিজস্ব স্বভাবে স্থিত এবং সক্রিয় হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রযুগ বলে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সময়কে চিহ্নিত হতে দেখি তাকে বাংলা সাহিত্যের পরম প্রাপ্তির যুগ বলাতে কোন অসুবিধে নেই।

রবীন্দ্র চিন্তা চেতনার শেষকথা পার্থিব শোক ও দুঃখ, কষ্ট ও অমঙ্গল, এবং নাস্তিতে আস্থা ও সমর্পণ নয়। এর থেকে উত্তরণ আর মঙ্গল বোধ ও প্রশান্তি এবং আনন্দময়তায় সর্বস্ব নিবেদন। প্রশান্ত শুভ্রতার স্নিগ্ধ প্রভা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সহ সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চিতে বিকশিত ও কালজয়ী করেছে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দুঃখের, বেদনার কবি নন। আনন্দ ও উজ্জ্বল উৎসাহের কবি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া এই আশ্বাস ও তার আকর্ষণ তাঁর সমসাময়িক ও অল্প পরবর্তীকালের কবিদের পক্ষে ছিল পরম আশ্রয় ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিরিশের কবিদের কাছে যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অনুসরণ হয়ে ছিলেন না। কেননা রবীন্দ্রনাথ আকৈশোর, তাঁর মানস গঠনের কালে যে প্রায় সুস্থির ও সময় ও সমাজ পেয়েছিলেন সেই উনিশ শতকের উদ্বেগহীন জীবন প্রণালী একালে কবিরা পাননি। সেই ভাবলোকের মঙ্গল ও শান্তির আশ্বাস যেমন ছিলনা, তেমনি যাবতীয় প্রথা, ন্যায়-নিয়মে আস্থা, নীতি-পরায়ণতা বা ঈশ্বরে দ্বিধাহীন ভক্তিও এসময়ে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়াও প্রকৃতি ও সুন্দরের কাছে যে নিঃশর্ত আত্মদান, পারিবারিক নিশ্চিত একাত্মতা ইত্যাদি সবকিছু প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এতদিনের পালিত সামাজিক ও অন্যান্য এবং মানসিক সকল সম্পর্ক গুলোর ভিতর এলো অবিশ্বাস। অবিশ্বাসই টেনে নিয়ে এলো বিক্ষুব্ধ দুঃস্বপ্নজর্জর অনাস্থা। এলো দুঃখবাদ, মানুষ টের পেল অমঙ্গল, অসত্য ও নাস্তিক্যবোধের যন্ত্রণা। যা কিছু প্রথাগত, প্রচলিত তাকে আবার নতুন জীবনবোধের, অবস্থার আলোতে, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রবণতা। সচেতনভাবে সবকিছুকে স্বীকার-অস্বীকার এবং মনোযোগী বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে জন্ম হলো নতুন প্রজন্মের। তাই খুব স্বাভাবিক এবং সংগত কারণে এই সময়ের সৃষ্টিশীল সচেতন কবি ও সাহিত্যিকেরা স্থির, নিশ্চিত অবস্থায় পুরোনো সুস্থিত কল্পনাবিলাসে

মগ্ন হতে পারেন নি। এই সময়ের ভিতর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এবং পাভলভের মনোবিশ্লেষণা পাঠের সুযোগে জানা হয়ে গিয়েছে মানুষের মনের জটিল বিন্যাস। যে মানব হৃদয় এতদিন জানা ছিলা একমুখী ও সমতল, সেখানে জানা গেলো তার দ্বিচারি বা বহুচারী গঠনকলা। তার গভীরতর রহস্যময় দিকগুলি। পরিচয় হলো মনের অতল থেকে উঠে আসা জটিলতম, অনাবিষ্কৃত অনুভূতিমালার খবর। অন্য দিকে কার্লমার্কস ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস প্রবর্তিত আধুনিক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার হাতছানি আমাদের পালিত অর্থনীতির অসাড়তাকে উপস্থিত করল আরও, এবারে, আরো সরল বিন্যাসে। নতুন জ্ঞানের দীপ্তময় জগৎ ও জীবনকে যে এইভাবে ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা, তারই ফসল তিরিশ ও পরবর্তী আধুনিক কবিতা, আধুনিক সাহিত্য।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের অটল স্থৈর্য ও উত্তুঙ্গ কল্পনা ঐশ্বর্য, অন্যদিকে বাস্তবের জীবনের এই রূঢ় পরিস্থিতি। এই দুয়ের সংঘর্ষ এবং যুগ্মতায় কিছুটা দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে একে একে কাব্যসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলেন বিশেষরূপে চিহ্নিত তিরিশের যুবক কবি ও সাহিত্যিকেরা। তাই এই বিশেষ সময়টুকুতে লেখা কবিতায়, সাহিত্যে এই দুয়েরই হাতছানি। একদিকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে, তাঁকে অস্বীকার করে অন্যজগৎ তৈরীর প্রবল বাসনা। অন্যদিকে প্রাচীন যা কিছু তাকে সমূলে নয় বিচার বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ফিরে পাবার উদ্ধত কামনা। দুটি নমুনা —

"বধূ শুয়ে ছিলো পাশে — শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো — জ্যোৎস্নায়, — তবু সে দেখিলো
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল — লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার"

(আট বছর আগের একদিন। জীবনানন্দ)

অন্যপ্রকারে —

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি — মিথ্যা সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা —
কটাক্ষ-ঈক্ষণা তার — হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত রচনা !

(পাপ্থ। মোহিতলাল)

সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথ তুষ্কার্ত অতৃপ্ত (নিরুপায়) হরিপদ কেরানিকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে হয় নি। এবং শেষপর্যন্ত অনন্ত সত্যের কাছে তার নিঃশর্ত সমর্পণ। বাঁশি কবিতাটির শেষ পংক্তি গুলি স্মরণ করতে পারি। —

'' হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চ'লে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী ;
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। ''

(বাঁশি । রবীন্দ্রনাথ)

সুতরাং তিনটি স্পষ্ট ভিন্ন বক্তব্য ও চিন্তা বিন্যাস সূত্রানুসারে আলোচ্য কবি অজিত দত্ত প্রসঙ্গে বলা যায় যে তিনি যেমন উচ্চকণ্ঠ হয়ে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির কথা বলেন নি বা তাঁর কাব্যে নেই চেষ্টাকৃত সেই প্রয়াস চিহ্ন , তেমনই রবীন্দ্রনাথকে অতিসহজে আত্মসাৎ করে তরল পদ্ধতিতে তাকেই হুবহু অনুসরণ, অনুকরণ করে কবিতা সৃষ্টিও করেন নি। তাঁর ভিতর রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করবার প্রবণতা আছে। আছে বাস্তব পরিস্থিতি ও নতুন বিধিব্যবস্থাকে গ্রহণের মানসিকতা যা নেই তা দুস্তরের বিদ্রোহ। নেই ঐতিহ্যকে অস্বীকারের প্রয়াস। তিনি নিজেও এ বিষয়ে ছিলেন পূর্ণ সচেতন — '' সম্প্রতি বাংলা কবিতায় মনোধর্মিতা বা ইনটেলেক্ট -এর প্রাধান্য অতি প্রবলরূপে প্রকট হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্য কবির প্রভাব সচেতন ভাবে আত্মসাৎ বা অনুসরণ করাও এ-যুগের

কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এ-সব দিক থেকে আমার কবিতা আধুনিক মাপান-বর্জিত সন্দেহ নেই। ''[১] নিজের কবিতার এই বিচার বিশ্লেষণ যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন কালেই চলিত পন্থা অনুসরণ করেন নি। কোন তাৎক্ষনিক ও উদ্ভূত মাপনের অন্তর্গত করেন নি নিজেকে। বরং ঐতিহ্য পালন সত্ত্বেও এই কবি বাস্তবের রূঢ়তার ভিতর থেকে কল্পনাকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় কোন এক স্বরে পৌঁছবার প্রয়াস নিয়েছেন। একটি নমুনা —

'' বাহিরে চাহিয়া দ্যাখো। আজি রাত্রি চমৎকার নয়?
হয়তো এমন রাত্রি এ-জীবনে আসিবে না আর।
জানুক সকল লোকে, এতটুকু করিনা কেয়ার,
কত ভালো লাগে আর ঔদাস্যের মিথ্যা অভিনয়।
নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
কুসুমিত অবকাশ দুজনার কাছে আসিবার । ''

(দুর্লভ রাত্রি। অজিত দত্ত)

রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলের ধারনা, বিশ্বাস অজিত দত্তের কবিতায় সুপ্রচুর নয় বা বিস্তারিত নয়। ' পূরবী ' কাব্যের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

'' বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার —
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার । '' (পূর্ণতা । রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের জগত জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ও অবিকৃতই ছিল। যদিও তাঁর সৃষ্টিজীবনে পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন তিনিও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছেন। বিচার

বিশ্লেষণ করেছেন। তথাপি এর এগুলি কিছুই তাঁর চিন্তাজগতে উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেও তিনি ক্ষুব্ধ-দুঃখিত হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন। তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তার পরিণামকে সীমায়িত করে দেখে ও পরবর্তী তাৎক্ষনিক ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আত্মস্থাৎ করার মানসিকতা তিনি দেখাননি। অবশ্য '' রবীন্দ্র প্রতিভার মৌল কথা ছিল অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। তিনি কোথাও থেমে থাকতে জানতেন না। ''[২] কিন্তু সেই সম্প্রসারণ বা থেমে না থাকার অর্থ আমাদের কাছে এই যে তার প্রতিভাকে তিনি যেমন চিনতেন তেমনি তাঁর চিন্তাপ্রবাহের গতিবিধি ও সহ্যকরার ক্ষমতা এবং সবকিছুকে গ্রহণের পর তার প্রকাশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। অজিত দত্তের কবি প্রকৃতির ধরণ অন্য-প্রকার। উগ্র আধুনিকতার খোলস তিনি স্বেচ্ছায় দূরে রেখেছিলেন - একথা সত্ত্বলেই যে তিনি রবীন্দ্রকাব্য বলয়ে প্রোথিত তা নয়। রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকারে তাঁর কোন সংকোচ ছিল না এটা সত্য। কিন্তু সেই সত্য রবীন্দ্রবিলাসে বা নিমজ্জনে নয়। তিনি রোমান্টিক, তবু ভাষার সহজ চলন, ঘরোয়া রূপ রচনার ভঙ্গি রবীন্দ্র রোমান্টিকতা থেকে এ লেখাকে স্বতন্ত্র করেছে। উদাহরণ —

'' দ্যাখো, দ্যাখো! মেঘ-ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গৃহ মোর ছেয়েছে আঁধারে।
কখন আসিবে তুমি? রজনী, সে আরো কতদূর!
এ মোর ভোরের স্বপ্ন - একি কভু মিথ্যা হ'তে পারে?
ফুলের স্পর্শের মতো নয়নে যা লেগেছে মধুর,
তুমি ছাড়া হেন স্বপ্ন বলো আর কহিব কাহারে? ''

(স্বপ্ন । অজিত দত্ত)

কবি অজিত দত্ত যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে কাল ছিল অস্থির। কবির জীবন প্রবাহও ছিল অনিশ্চয়তা এবং অশান্তিতে পূর্ণ। শিক্ষা ও পরিপার্শ্ব অন্যর চিত্তে গ্রথিত তাই স্নিগ্ধ এই বাচন পদ্ধতিতে ঔজ্জ্বল্য থাকলেও যেমন বিদ্রোহ নেই, সেরকম বৈষ্ণব কবিতার নিঃশর্ত সমর্পণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই উপস্থিত তবে আত্মীকরনে সক্ষম এর প্রকাশ ভঙ্গি আমাদের চিনিয়ে দেয় এর নিজস্বতাকে। বস্তুত অজিত দত্ত কবিতায় যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা ঐতিহ্য পালনের আকাঙ্ক্ষায়। এবং নিজের অধীনতায় যা গড়ে উঠেছে তা স্বাধীন ও স্বায়ত্ত শাসনের ফলে।

রবীন্দ্রনাথের একটি অংশ পরিচয় তিনি প্রেমের কবি। এই প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। উল্লাস বা কামজ সংঘাত নয়। '' দেশের কাব্য সংসারে প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কামের বাহুপাশ হইতে কবি প্রেমকে উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়াছেন। ''[৬] প্রকৃতপক্ষে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তাঁর কাব্যে প্রেমের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। তা ভোগের বা কামের উপকরণ শূন্য নয়। সে উপকরণ দিয়ে ভোগ সাজানোর আয়োজন আছে, 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র প্রথম কিছু কবিতায়। কামকে রতিকলাকে যে উপায়ে তিনি ব্যবহার ও প্রবাহিত করেছেন তাতে যুক্ত হয়েছে ঐশ্বরিক মহিমা। তাই সেগুলিকে কামজ বলে চিহ্নিত করা অসম্ভব। তাঁর কাছে কোন অবস্থাতেই নারী ইন্দ্রিয়াসক্ত সুখ, ইন্দ্রিয় অতীত এক শুদ্ধ অনুভূতি। অনেকটাই বৈষ্ণবীয় পদাবলী প্রেমের মত —

'' যত গোপনে ভালোবাসি পরাণ ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ - আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে। ''

(গুপ্ত প্রেম। রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্র প্রেম মানবসহচর, নারীর রয়েছে দ্বিবিধ সত্তা - কল্পনায় ও দেহগত রূপে মূর্তবিগ্রহে অজিত দত্তের কাব্যেও ভোগের আয়োজন নেই। উপস্থিত নারীটি রক্ত মাংসের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। উপলব্ধি বা পূজার আলোতে দেখা, জানা ও বোঝার প্রয়োজন নেই। কবিও নির্জনে তাকে পবিত্র প্রেমটুকুই দানে আগ্রহী। অন্যের উপস্থিতি সেখানে কাঙ্খিত নয়।

'' বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘু পদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন রাতের বাতাস। ''

(কুসুমের মাস। অজিত দত্ত)

অথবা অন্যত্র —

'' মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চন্‌চন উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম। ''

(একটি কবিতার টুকরো। অজিত দত্ত)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের নানা প্রসঙ্গ ও উৎস। প্রেমের আধারও নানাবিধ। অজিত দত্তের কবিতায় এই বিপুল ঐশ্বর্য নেই। থাকা সম্ভবও নয়। যদিও একথা সত্য প্রেমকে তিনিও চিরকালীন করার জন্য সমাজ সংসার থেকে দূরে সরে থাকায় দ্বিধাজড়িত নন। নয় শান্ত এই প্রেম কেবল নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রবহমান। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, এই পরিচয়টিও অখণ্ড নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের যেন। তাঁর প্রকৃতি একদিকে মানুষের ভিতর প্রবেশ করে মানবীয় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত; অপরদিকে প্রকৃতির অন্তর্গত মানুষ শেষপর্যন্ত প্রাকৃতিক মানব মূর্তির প্রকাশ করেছে। এই দ্বিবিধ রূপ ও রূপান্তর তাঁর প্রকৃতিভাবনাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। একথা কবির নিজের ভাবনাতেই আছে।* তার প্রকৃতি কোথাও শান্ত ও কোমল মূর্তি। কোথাও তা আনন্দ প্রবাহ। আবার করাল ও সর্বগ্রাসী প্রকৃতি চিত্রও তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে এই প্রকৃতি নিঃসন্দেহে পটভূমিকা হিসেবে নয়। মানব জীবনের অঙ্গস্বরূপ তাঁর প্রকৃতি নিঃসন্দেহে তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী যা জগৎ লক্ষ্মীও বটে। একথা সত্য প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট কবি তাকেই আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল —

"হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহো দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি — মাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোকানন্দন মূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষ্ণায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
* * *
একাকিনী বসে আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।"

(জ্যোৎস্নারাত্রে । রবীন্দ্রনাথ)

একুশ বছর বয়সে লেখা 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' কবিতায় অজিত দত্ত পৃথিবীর রূপকে-প্রকৃতিকে দেখেছেন ' অবাক বিস্ময়ে। ' প্রেমের মায়াঞ্জন তখন তাঁকে বিবশ করে রেখেছে -

'' একদিন স্বর্গ হতে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্যলোকে - কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল।
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব - নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।
দেখিলাম পৃথিবীর লাল ফুল, কালো বিভাবরী,
সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল। ''

অজিত দত্তের এই 'প্রকৃতি' চেতনা কোন প্রকার প্রণয় নির্দেশ করছে না। কতকটা গ্রীক পুরাণের সেই ওড়ার ক্ষমতাবান মানুষের দৃষ্টিতে কল্পনা বিস্তারিত হয়েছে। যথাযথ এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির রং রূপ, রস আস্বাদনে তিনি যে তৃপ্তি পান, সে কথাই বর্ণিত। অতিরিক্তের আগ্রহহীন প্রায় নিরপেক্ষ এই দৃষ্টিতে অবশ্য উদাসীনতার কোন প্রকাশ নেই। অথবা তা হয়ে ওঠেনি কেবলমাত্র কবিতা বিষয়ক পটভূমি। আবার রবীন্দ্র প্রকৃতির মত তা কবির কাব্য লক্ষ্মীশ্বরূপাও নয়। রবীন্দ্রনাথে প্রথম যে ... পরিচর্যা ইন্দ্রিয়গত ও শেষ পরিচর্যায় যে বিশ্বগত ইন্দ্রিয় অতীত অনুভূতি এঁর কাব্যে এ সবের কোন-টিই নেই। প্রকৃতপক্ষে শুধু প্রকৃতির উপাসনাও অজিত দত্ত কোন কবিতায় করেন নি। সর্বত্রই জীবনের একটি ভূমিকা সেখানে এসেছে। তবে তা তার একান্ত নিজস্ব জীবন পদ্ধতির অনুসরণে। প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন - রূপ করেছেন-তার উত্তাপটুকুও গ্রহণ করেছেন-তবে তা কোন অবস্থায়ই অন্যসকলের অনুকরণে নয়।

সমকালের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এরা সকলেই রবীন্দ্র-নাথকে মান্য করেছেন। সময় বিশেষে কমবেশি তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন। এবং সকলেই রবীন্দ্র যুগের কবি। তবে নিজস্বতায়, বৈশিষ্ট্যে এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ১৯২০) কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২ -১৯৭০) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮ - ১৯৫২) জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ -১৯৫৪) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮- ১৯৭৪) এই পর্বে আমাদের আলোচ্য কবি।

কবিদেবেন্দ্র নাথ সেন এক কথায় *Romantic* গার্হস্থ্য জীবনের কবি। এই গার্হস্থ্য জীবন তৃষ্ণাই দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার চালিকা শক্তি। নমুনা -

'' এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে বাজে।
পাটল অধরে তার,

চন্চল ধূসর কেশে

তুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—"

(আমি কে । দেবেন্দ্রনাথ সেন)

অথবা '' খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এ দোষ ওর

থোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর ।"

কবির এই বাঙালি গৃহমুখী প্রেমানুভূতি অথবা সেই নিহিত নির্ভরতাই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের উদ্বোধিকা। মোহিতলাল মজুমদার চমৎকার বলেছেন - '' কাব্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যই প্রথম হইতে তাহার হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছে , সৌন্দর্য্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার হইয়াছে, সৌন্দর্য দৃষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে, ...।''[৪] অজিত দত্ত অবশ্য গার্হস্থ্য জীবন প্রণালীর স্মরণে মগ্ন নন। আবার কোথাও বিষয়ের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিতও তিনি করেন নি। তাঁর কবিতায় বাঙালির যে গার্হস্থ্য জীবন চিত্রের পরিচয় আছে, তার অনেকটাই স্মৃতিবিধুর তাই আবার বিশুদ্ধ ও কিছুটা মন্থর জীবন যাপনাকাঙ্খীর সঙ্গেও যুক্ত। দুটি নমুনা -

'' শুধু এই সাধারণ নীড় — সে তো মানে না শাসন,
পুরোনো স্নেহের মোহে চিরদিন রয় সাধারণ,
ছোট ছোট সুখ আর দু:খের আল্পনা এঁকে
অনুশাসনের যত ক্ষত রাখে ভুল দিয়ে ঢেকে ।''

(সাধারন । অজিত দত্ত)

অথবা' খান্ডব দাহন' কবিতায় পাই—

'' কয়েক প্রহর আগে, এখানেও ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
সহজ বাৎসল্য - প্রেম, আশা স্বপ্ন শৈশব - যৌবন,
সবি ছিল প্রাণোচ্ছল, ছিল মৃদু জীবনের ঘিরে
আনন্দের আকাঙ্খার স্পন্দিত ছন্দিত আবরণ। ''

অজিত দত্তের গার্হস্থ্যজীবন চর্যার যে প্রকার পরিণতি তার কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে তার মূল প্রেরণা শাশ্বত জীবনবোধে আস্থা আর তা প্রায় বিনম্র প্রেমানুভূতির মতই স্নিগ্ধ।

যথাযথ গার্হস্থ্য জীবন নয়, গ্রাম জীবনের ধ্বনি বুকে নিয়ে সরল-আভরণহীন ম্লান ছায়ার মত কণ্ঠস্বরে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতায় যখন পাই —

'' গুটি ছয় পায়রা ও গুটি কত হাঁসরে
আমাদের ঘরে করে একসাথে বাসরে।
আসে কাক একঝাঁক
করে খুব হাঁকডাক
কোকিলের কর্ণসার্ট শুনবিতো মাসিরে। ''

(আমাদের সঙ্গী। কুমুদরঞ্জন)

আর এই কবিতারই শেষে যখন তিনি বলেন' এক সাথে কোথা পাব এত সাধু সঙ্গী ' তখন কবির পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়, তা হলো সমগ্র বিশ্বকে তিনি কামনার ধন করেন নি। একখণ্ড গ্রামই তাঁর ঈপ্সিত। অজিত দত্তর সঙ্গে এখানেই তার অন্তরঙ্গ মানসিক যোগ। তিনিও বৃহৎবিশ্ব সম্পর্কে সদা কৌতূহলী নন, বা তুমুল সংরাগ প্রায় কোন কবিতাতেই নেই। তিনিও কুমুদরঞ্জনের মত বলেছেন -

'' সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু গিরি মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ -
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা। ''

(জানালা। অজিত দত্ত)

একথাও মনে রাখতে হবে যখন একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দিগ্গ্রাহরিক কল্পনা দীপ্তি,অন্য দিকে আধুনিক কবিদের বহুচারী নতুন তত্ত্ব এবং এই উভয় প্রস্তাবই প্রায় যত্নে ও রচনা প্রকরণগত ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে কুমুদরঞ্জন পল্লীজীবনের শান্ত আশ্রয়ে তাঁর প্রীতি ও ভক্তি উন্মোচন করেছেন। অজিত দত্ত নাগরিক কোলাহলে স্থিত হয়েও স্বপ্ন ও রূপকথার জগতে নিজের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন।* রূপসী বাংলার আর এক কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই গ্রামমুখী, অপার সীমিত ও আচ্ছন্ন প্রীতির অনুভব লক্ষ করা যায়। নমুনা -

'' বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : ''

(রূপসীবাংলা। জীবনানন্দ)

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ক্ষেত্রে যা তার গোটা জীবনের প্রক্রিয়া ও বিশেষভাবে পল্লী আশ্রিত রূপাবয়ব নির্মান। জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে তাই'' খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে''[৫] রচিত।

অজিত দত্তের কাব্য রচনার শুরুর পর্বে যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকে, তবু তখনও তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণত অপসৃত হয় নি। যদিও অজিত দত্তের কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, তবু কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের কবি স্বভাবের পার্থক্য দুটি নমুনা দ্বারা আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি। সত্যেন্দ্রনাথ প্রেমের প্রসঙ্গে —

"মধুর মত মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশ্বাসখানি পড়লে জো'রে হ'তাম গো নিশ্চুপ। -''
(তোড়া। সত্যেন্দ্রনাথ)

অজিত দত্ত সেই প্রসঙ্গে -

'' তোমারেই ভালোবাসি। সত্য আজ শোনায় চাতুরি
বহু প্রণয়ের জালে আবদ্ধ অতীত-ক্রীত মনে।
সঙ্গমাত্র আহরণ, তারপর তোমারে ফেরাই।
স্মরণের অবরোধ ছিন্ন করে যতটুকু পাই
তোমার সান্নিধ্যে আসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত চয়নে
দুর্লভ তোমার সাথে হৃদয়ের খেলি লুকোচুরি।।''
(চুরি। অজিত দত্ত)

দুটিই প্রেম বিষয়ক কবিতা। কিন্তু প্রথমটিতে প্রেমের বহিরঙ্গ উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয়টি তারই অন্তরঙ্গ সন্চার। প্রথম কবিতাটি আমাদের আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়টি আপ্লুত করে। কবি সমালোচকের কথায় পাই[৬] —'' কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের [illegible] অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন।''[৬] সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে শুধু মালাই রচনা করেছেন, অজিত দত্ত সেখানে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ভাবব্যঞ্জনাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাস কথা ও পুরাণের প্রসঙ্গ এঁদের দুজনের কবিতায় অনেকবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি -

'' সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ - গুহায়
জ্বলে তায় চির - পূজা - ধূপ,
সম্রাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স্বরূপ। ''

(তাজ । সত্যেন্দ্রনাথ)

এবং

'' অকস্মাৎ চাদ্‌মতো সে - মিছিল স্তব্ধ করি দিয়া
গৌরবে রানির মতো, মহীয়সী, তুমি এলে ধীরে;
মুগ্ধনেত্রে চাহিলাম। তোমার দু চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র - সম সমস্ত স্বর্ণ ডুবে গেল মুহূর্ত কাঁপিয়া , ''

(প্যারাডাইস লস্ট। অমিত দত্ত)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ সরাসরি স্বনামে ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। অমিত দত্ত তাকেই ব্যবহার করেছেন ঘুরপথে - নামগোত্র পরিচয় মুক্ত রূপে।

মর্ত্যজীবনে প্রকৃতি ও পুরুষ যুগ্মভাবে জীবনকে বিকশিত ও অর্থবহ করে তোলে। তাই প্রকৃতিরূপী নারীকে তার শরীরী সত্তায় স্বীকারই যথার্থ। পাশাপাশি নমনীয় পার্থিব বিকাশে দেহ অনিবার্য সত্য। নতুবা গোটা ব্যাপারটাই কল্পনার বিষয় হয়। সমালোচনায় বলা হয়েছে, মোহিতলাল বাংলাকাব্যে ভোগধর্মী দেহবাদের প্রবক্তা। আমাদের বিবেচনায় তিনি তাঁর কাব্যে সুস্থ ও স্বভাব অনুগত শরীরকে স্বীকার করেছেন, সেখানে ভোগের কোন উত্তাল দাপাদাপি নেই। তাই কামনা বাসনায় জারিত দেহও কখনো বা শান্ত ও অলৌকিক হতে চায় কোন বিশুদ্ধ সত্তায় —

'' মর্ত্য - পারিজাত ওই দু'অধর শোনিত - বরণ,
পিপাসার মৃত - সঞ্জীবনী —
নিবিড় চুম্বন যার — মুমূর্ষুর সূচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী —
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয় - মধুশূন্য - বর্তিকা ''

(অকাল - সন্ধ্যা । মোহিতলাল)

অজিত দত্তের অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে। তাই তিনি জানেন —

'' দন্ডেই নেশা পলেই ফতুর এমনি তোমার জাদু ।
আমার রক্তে যে - স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু ?
দিগন্ত - ছোঁয়া কান্তার — মাবে বিলাস — লীলার হর্ম্য,
সম্মুখে ত্রিশূল উদ্যত, বুকে পুণ্যলিপির বর্ম !

(চৌকাঠ । অজিত দত্ত)

' বন্দীর বন্দনা' এবং 'কুসুমের মাস' দুটো গ্রন্থই শেষপর্যন্ত ব্যক্তি নির্ভর ও আত্মকরুণা পীড়িত। তবে ব্যক্তিত্বের মাত্রাভেদে ও বিষয় বস্তুর বৈপরীত্যে অজিত দত্ত যেখানে বিবর্তনধর্মী ও প্রবহমান, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সেখানে - ''গতির দিকদিয়ে প্রায় সব কবিতার গড়ন আবর্তনধর্মী, রেখাকার নয়। এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে বয়ে যাওয়ার এবং স্বরের আবেগকে আরও দূরে প্রসারিত করে দেবার শরবৎ গতি এ কাব্যে নেই। ''[৭] বুদ্ধদেব বসু লেখেন —

'' বিধাতা, জানো না, তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না - হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পংকের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু । ''

(বন্দীর বন্দনা । বুদ্ধদেব বসু)

অজিত দত্তের কবিতায় ব্যক্তিত্ব বা Personality র ঘনীভূত উত্তাপ সহজেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবার বুদ্ধদেব বসুর মতো তিনিও ব্যক্তিগত অনুভূতি নির্ভর। তাই তাঁর কাব্যেও প্রবল ব্যক্তিসত্তার প্রবাহ লক্ষনীয়। সেদিক থেকে এঁরা উভয়েই এক গোত্রের । তবে বাচনিক ভঙ্গিতে বুদ্ধদেব বসু যেখানে উচ্চকন্ঠ ও মুখর অজিত দত্ত সেখানে অপেক্ষাকৃত মৃদুকন্ঠ, আত্মমগ্ন এবং দ্বিধাগ্রস্থ। প্রেমের আকাঙ্খা ও তার বিন্যাসে এরা পৃথক। অজিত দত্ত লেখেন —

'' আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে - কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু - অবকাশ। ''

(কুসুমের মাস। অজিত দত্ত)

'' কবিতার ভাষাই কবির প্রতিভার অব্যর্থ চিহ্ন। সমগ্র কবিতার পরিপূর্ণ সুখ দুঃখের বিচ্ছুরিত বর্ণালী হল কবিতার ভাষার ভিন্ন ভিন্ন স্তর।'' [৮] এদিক থেকে জীবনানন্দ দাশ ও অজিত দত্তের মধ্যে ভাষা শৈলীর স্বাতন্ত্র্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন —

'' শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার – চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ ''
(অবসরের গান । জীবনানন্দ দাশ)

আর অজিত দত্ত লেখেন –

'' দ্যাখো, দ্যাখো ! মেঘ – ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গৃহ মোর ছেয়েছে আঁধারে। ''
(স্বপ্ন । অজিত দত্ত)

উপরে উদ্ধৃত দুটি পংক্তিগুচ্ছই দুই কবির নিজস্ব শব্দ নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিধি তাঁদের আলাদা করে যেমন চিনিয়ে দেয় তেমনি প্রতিটি শব্দের নিহিত ব্যঞ্জনা উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অর্থ (Meaning) অতিক্রম করে কবিতার ভাব প্রবাহকে বিস্তার দিয়েছে। অবশ্য যে আয়োজনে '' রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে কবি ভাষার নতুন রূপ ও বর্ণ সৃষ্টি করে জীবনানন্দ দাশ আমাদের অনুভূতির জগতকে নব-নব আস্বাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন'' [৯] সেই প্রকারের বিস্তারিত ও যুগসৃষ্টি সম্ভব কবিভাষা অজিত দত্তের কবিতায় নেই। সেদিক থেকে তিনি বরং কিছু রবীন্দ্র অনুসরণাকাঙ্খী।

জীবনানন্দের কবি জীবনে স্পষ্ট দুটি ক্রম। একটি বরিশালের প্রবাহিত প্রকৃতি মুখর যুগ। দ্বিতীয় ক্রমে কলকাতা নগর জীবনে স্থিত যন্ত্রযুগের কালসীমা। এবং উভয় পর্যায়ের কাব্য ভাবনা, বিষয় বস্তু, বিন্যাস ও প্রয়োগবিধি বহুক্ষেত্রে অন্যপ্রকারের। অন্যদিকে অজিত দত্তের কাব্যের শব্দে কোন স্থানিক পার্থক্য নেই। যদিও তাঁরও প্রথম যৌবন কেটেছে ঢাকায়। পরবর্তী সময়ে তিনিও ছিন্নমূল ভাবে স্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তার 'নষ্টচাঁদ' ও পরবর্তীকালের সামান্য কিছু কবিতায় মাত্র ভিন্ন সুর, অন্য প্রকারের বিবেচনা আছে। 'ধূসর পান্ডুলিপি'র কালে জীবনানন্দ লেখেন —

'' আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার, কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব, '' (মৃত্যুর আগে । জীবনানন্দ)

আর কবির 'সাতটি তারার তিমির' কবিতাগুচ্ছে পাওয়া গেল -

'' পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান। ''

(বিভিন্ন কোরাস ১। জীবনানন্দ)

তবে কাব্যিক বিবর্তনের রেখা অজিত দত্তের কাব্যকে স্পষ্টত তাঁর উত্তরণ অথবা পরিণতি চিনতে আমাদের সাহায্য করেছে। স্বভাব সংযমী কবি অজিত দত্ত তিরিশ দশকের বিস্ময়। বিস্ময় কেননা এ সময়ের বিস্তৃত ও বহুমুখী জটিল জীবন চক্রের সাময়িকতায় তিনি মুগ্ধ ও আকর্ষিত নন। নিজেকে চলিত ফ্যাশনের অন্তর্গত করার কোন মানসিকতাও তাঁর ছিল না। জীবনানন্দ যেমন প্রথম কবিতা রচনাকালে তথাকথিত 'সর্বগ্রাসী ভঙ্গুর অবিশ্বাসে আত্মমগ্ন হবার কথা।'* ভাবেন নি। অথচ সেই সময়ে বসে অপরাপর প্রায় সব কবি কমবেশি এই ব্যাপারটি গ্রহণ করে সচেতনভাবে 'আধুনিক' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বা বিষ্ণু দে প্রমুখদের কাব্য প্রকরণ ও পদ্ধতি এবং বিষয় নির্বাচনে ও বিন্যাসে উপরে কথিত শর্ত প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন ভাবে যৌবনের ক্ষুধামিশ্র বাসনা কামনামুখর আর্তি বুদ্ধদেবের কবিতাকে বোদলেয়ার বা র‍্যাঁবোর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। বস্তুত তাঁর কবিতায় romantic idealism অনুপস্থিত। রোমান্টিকতা বলতে তিনি বুঝেছেন - '' রোমান্টিক বলতে আমি বুঝি শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা। যা ব্যক্তি মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয় - শুধু ইস্ত্রি করা এটিকেট মানা সামাজিক জীবটি কে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে, তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় - সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।''[১০] প্রেমের শারীরিক বাসনা-কামনা ও জীবনের দুঃখময় পরিস্থিতিকে স্বীকার করার প্রবণতা তাঁকে করেছে অস্থির, তাঁর কাব্যকে করেছে আধুনিক। কিন্তু '' বাঙালী কবির পক্ষে সবচাইতে বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তন। এ সূত্রেই ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আসে। জীবনানন্দ সমসাময়িক আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ঐতিহ্যবাদী।''[১১] কেননা জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত দুজনেই একই সঙ্গে কবিতার সততা, বিশুদ্ধতা, অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকার ও ঐতিহ্যে বিশ্বাস রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। জীবনানন্দ বিশ্বাস করেন - " যে কোনো সময়ের যে কোন জগতের সত্য অভিজ্ঞতা

114314
21 JAN 1997
NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

কোনো এক বিশেষ আধারে যন্ত্রে প্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্পন্দিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শে তায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন — কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে। ''[12] তাই এযুগে বসে জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন —

'' সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোর আঁধারে।
সহজ লোকের মতো তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর, কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর, – শরীর স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর। * * *
* * * *
স্বপ্ন নয়, – শান্তি নয় – কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে। ''   (বোধ । জীবনানন্দ দাশ)

অথবা অজিত দত্ত যখন নেশাতাড়িত মানুষের মত বলেন —

'' মদের নেশার মত তাহাদের বাসিয়াছি ভালো,
সমস্ত ব্রহ্মান্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর,
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো।
জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে – মরণ মধুর। ''
(পরী । অজিত দত্ত)

তখনই টের পাওয়া যায় এঁদের দুজনের কবিত্ব শক্তির বিশুদ্ধতা। সমর্থন মিলে যায় ঐতিহ্যকে স্বীকার ও তাকে আত্মগত করে নেবার প্রবণতা। তাই ঐতিহ্যকে আত্মগত করে নিজেদের সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণত সংস্কার মুক্ত ও বিশিষ্ট কবি চেতনাকে যে উপায়ে প্রবাহিত রাখতে পেরেছিলেন তাতে এঁদের বিশুদ্ধ আধুনিক কবি বলা যায়। তার এই আধুনিকতা শুধুমাত্র রূপগত বা বহিরঙ্গের কোন প্রসাধন নয়। তা এরই সঙ্গে মনন ও হৃদয়জাত এবং শুদ্ধত চেতনা সমৃদ্ধ। অবশ্য উভয়ের আয়োজন ও পরিকল্পনায় পার্থক্য রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সাহিত্য প্রবাহের শ্রেষ্ঠ অংশটি চিরকালেই একই উপায়ে ব্যক্তিচেতনা আচ্ছন্ন। এবং সেখানে বিশেষভাবে কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ। আর তার সঙ্গে

অনেক সময়ই যুক্ত হয়েছে হৃদয় বা ভাবময় কবিব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে - সুস্থির নয় এমন সময়ে এ সবের মূল্য, উপস্থিতি, অনাকাঙ্খিত ও অসম্ভব এই বিশ্বাসে কাব্যসাহিত্য রচনা পদ্ধতি হলো কখনো বা শ্রেণীগতা* এই শ্রেণীগত কাব্যরচনার প্রয়াস জীবনানন্দ দাশ অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখদের নেই।

অজিত দত্ত স্বভাবী রূপকথার ছায়াইচ্ছন্ন একটি জগত গড়তে চেয়েছিলেন। এবং প্রচ্ছন্নরূপে রূপকথা কথিত সেই মায়াচ্ছন্ন জগত আশ্রয় করে আছে প্রতীকী বাস্তবতাকে। সুতরাং শুধু রূপকথা বললে যে অসম্ভব এক কল্পনা বিলাস বোঝায় তা কিন্তু অজিত দত্তের প্রার্থিত সত্য নয়। আমরা একে বলতে পারি রূপকী রূপকথা। যেমন —

'' কুমার শুনেছে রূপকথা,
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

(পাতালকন্যা। অজিত দত্ত)

রূপসী বাংলা লেখার কালে এবং পরবর্তী কালে জীবনানন্দের কোন কোন কবিতায় সরাসরি এই রূপকথা জগতেই আত্মসমর্পণ আছে। একটি উদাহরণ -

'' মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম, - শোনো তবে, -
শুনিতে লাগিল সবে, -
শুনিল কুমার;
কহিলাম, - দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে, - নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে,
সেইখানে আর নাই কেহ, —

* * *

এর যেন কোনদিন ছিলো না হৃদয় -
কিম্বা ছিলো - আমার জন্য তা নয়।''

(পরস্পর। জীবনানন্দ দাশ)

বাংলার রূপকথাকে প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন দুজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বস্তুত উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে বাংলার প্রাচীন ও প্রায় লুপ্ত, ক্ষয়িত এই পুরা-নিদর্শন উদ্ধার আকাঙ্খা তখন অনেকেরই পেয়ে বসেছিল। নতুন দৃষ্টির আলোক স্নানে শুধু বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে - শিল্পে নতুন প্রথায় পুনর্জন্ম হলো রূপকথার। রবীন্দ্রনাথ রূপকথার গল্পগুলিকে কবিতার স্তবক বিন্যাসে আর এক প্রস্থ সাজালেন -

'' তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানু চুম্বিত। গোলাপি অঞ্চল খানি,
লজ্জার আভাস - সম , বক্ষে দিল টানি। ''

(বিম্ববতী । রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে বাংলার এই প্রাচীন রূপকথা গুলিকে classical বা চিরায়ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন সেই পথেই পরবর্তীকালের মোহিতলাল, জীবনানন্দ, অজিত দত্ত প্রমুখ কবিরা তাঁদের রচনায় রূপকথার অনুষঙ্গ শব্দ চিত্ররূপ সৃষ্টি করে এই ধারাটিকে পুষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্র কথিত রূপকথার প্রয়োগ বিধি জীবনানন্দের কাছে পৌঁছে ইতিহাস চেতনায় যুক্ত হয়ে নতুন স্বাদ ও মাত্রা যোগ করেছে। নমুনা -

'' আর তারা আসে নাকো ; সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুল জুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে - কত পাটরানীদের গাঢ় এলো চুল
এই গৌড় বাংলার - পড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে ''

(১৮ সংখ্যক কবিতা। রূপসীবাংলা।জীবনা-
নন্দ দাশ)

আর রোমান্টিক সুর সংযোজনায় রূপকী - রূপকথার পরিমন্ডল রচনার প্রকরণে অজিত দত্ত কিছুটা রবীন্দ্রনাথের নিকটবর্তী। তবে তাঁর কবিতার রূপকথার ব্যবহৃত রূপক রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক বেশি আধুনিক মন ও সময়ের কাছাকাছি। বাস্তবের মত্ত ইংরেজ রাজত্ব যেভাবে ভারতের স্বাধীনতাকে হরণ করে তাকে প্রাণহীন করে ছিল তার বর্ণনায় কবি অজিত দত্ত রূপক রূপকথার আশ্রয় নিয়েছেন এভাবে -

'' এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙিতে জেলেরা
তারা দেখে অশ্বে যোড়া পরিখায় ঘেরা

বাতাসে ভাসিয়া আসে পথিকের দূর অনুরাগ,
মুকুরের প্রতিবিম্ব মিশে যায় চোখের কাজলে। ''

(মালতী। অজিত দত্ত)

মোহিতলালে পাই -

'' মনে হ'ল দিকে দিকে প্রিয়ারি পীরিতি
উথলিছে লাবণ্যের মত ! সে মিলন
অহরহ - কোথা নাই বিরহ - কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা, - মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল! ''

(পুরুরবা। মোহিতলাল)

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় সমকালে* সবচেয়ে বেশি দেহকে আশ্রয় করেছেন। শুধু নর ও নারী উদ্ভিদ জগত ও তাঁর হাতে পৌঁছে মানবীয় শরীরী স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু অজিত দত্তের কবিতায় নারীরা এ জাতীয় অভেদাত্মক কল্পনা শূন্য। প্রসঙ্গত বলা যায় জীবনে নারীর উপস্থিতি বিষয়ে অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর জিজ্ঞাসা প্রথম জীবনে সমার্থক। দুজনের দুটি নমুনা তুলে দিচ্ছি —

'' নারী - তুচ্ছ নারী ল'য়ে যাবে দিন ? কটাক্ষের কণা,
কভু বিন্দু হাস্য - মধু তা'রি তরে উঞ্ছবৃত্তি করি
জীবন যাপিতে হবে? ''

(এমনি বাঁচিয়া র'বো। অজিত দত্ত)

বুদ্ধদেব বসুর - '' আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে? অমিতের লাবণ্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভু ? * * *
* * * *
কাহারে করিবো ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে ? নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংসস্তূপ,
শরীর সর্বস্ব, মূঢ়। ''

(কোন বন্ধুর প্রতি। বুদ্ধদেব বসু)

বাংলা সনেট শিল্পী হিসেবে অজিত দত্ত একজন অন্যতম প্রধান কবি পুরুষ। এ বিষয়ের উল্লেখ করেই আমরা বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করব। আধুনিক বাংলা সনেট অজিত দত্তের হাতে এসে পুনরায় নতুন ঐশ্বর্য ও লাবন্য পেয়েছে। রীতি পদ্ধতি সূত্রে নিষ্ঠাবান সনেট রচয়িতা কবি মোহিতলাল মজুমদার এক্ষেত্রে তাঁর সহযাত্রী এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সতীর্থ। তবে অজিত দত্ত বা মোহিতলাল যেখানে স্বভাবত পেত্রার্কাণ - গঠন ও রূপ মিল নির্মানে বিশুদ্ধ ভাবে ক্ল্যাসিক্যাল দেবেন্দ্রনাথ সেখানে প্রধানত মিশ্ররীতির* উপাসক' নমুনা -

'' নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে -

অর্ধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে।
দাড়িমের মুক্তার ; চল জেহরাজে;
দোহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে ! ''

(প্রিয়তমার প্রতি। দেবেন্দ্রনাথ সেন)

এবং

'' গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবার অছিলায়
কহিলাম, ' এক গ্লাস জল দেবে ? পেয়েছে পিপাসা।
যারে কহিলাম সেই বুঝিল কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দু'টি লাল হ'য়ে উঠিল লজ্জায়। ''

(গুরুজনদের মাঝে। অজিত দত্ত)

বাক্‌রীতির বিশিষ্টতায় অজিত দত্তের সনেটগুলি এককথায় অনবদ্য। সনেটের প্রকৃত গঠন- বিন্যাসে অষ্টক্ - ষট্‌ক নির্দিষ্ট এবং মিল রচনায় বিশুদ্ধ ভাবে পেত্রাকান। উদ্ধৃত সনেট অংশটিতে* তার সব কবিতার সেই স্বাভাবিক সংযত ভাব বিন্যাস আছে। তিনি এক্ষেত্রে তাঁর সনেটগুলিতে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দব্যবহার করে অনায়াসে তাতে সঙ্গীত সম্ভাবনা যুক্ত করেছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত জগতের সব মানুষের প্রতি ভালবাসার যে অসীম আকুতি দেখিয়েছেন সেইখানে অজিত দত্ত তাঁর সতীর্থ। আশাবাদী এবং যুগসৃষ্টি হতাশা - যন্ত্রনায় কাতর ও তার থেকে উত্তরণে আকাঙ্খী উভয় কবিহৃদয় কখনোই নিরাশার চোরা স্রোতে আটকে যায় নি। শেষপর্যন্ত আমরা অজিত দত্ত খুঁজে পাই —

'' জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যতখেলা পাতাদন, সাব একভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়,
তারপর শূন্য দিনে, বিষন্ন রাত্রিতে
হারানো এ ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে তারায়। '' (হারানো নিমেষ। অজিত দত্ত)

উল্লেখপঞ্জী

১. কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা। অজিত দত্ত। পৃষ্ঠা - ১)০

২. পরিশিষ্ট ১। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ। অরুণ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ২২৭

৩. রবীন্দ্র কাব্যের স্বরূপ। রবিরশ্মি, ১ম খণ্ড। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা - ৩৪

* কবি বলেছেন - '' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটি নিত্য মিলন আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিস যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমরাই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে। ''

- মানব প্রকাশ। সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ

৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা - ১৩৫

* এই কথারই সমর্থন আছে কবির নিজের কথায় - '' প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি পল্লীর সম্পদ, তাহাদিগকে আমি গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বুনিয়াদী জীবন্ত অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বর্ষায় অজয়ের বন্যা, অন্যসময়ে তাহার লহরীমালার নৃত্য, এমন কি তাহার ধূসর বালুচর দেখিয়া আমি ক্লান্ত হইনা, দিনের পর দিন দেখি। '' - পরিবারের চিঠি। শ্রাবণ, ১৩৪৭ সংখ্যা

৫. ভূমিকা। রূপসী বাংলা। অশোকানন্দ দাশ

৬. কাব্যের মুক্তি। স্বগত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পৃষ্ঠা - ১৫

৭. জলের মত ঘুরে - ঘুরে একা কথা। শিবচন্দ্র লাহিড়ী। আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ। সম্পাদক, জীবেন্দ্র সিংহ রায়। পৃষ্ঠা - ১৩২

৮. কবিতার ভাষা : জীবনানন্দ। শিশির কুমার দাশ। জীবনানন্দ স্মৃতি। দেবকুমার বসু সম্পাদিত।

৯. আমার কালের কয়েকজন কবি। জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ১৮

* 'কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধে ও 'আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে অরুণ ভট্টাচার্য আশ্চর্য ভঙ্গিতে এই কথাগুলি বলেছেন। যা আমাদের বিবেচনায় যথার্থ।

১০. ভূমিকা। শর্লিরেজদলেয়ার তার কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। পৃষ্ঠা - ৪

১১. কবি জীবনানন্দ দাশ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ১৩

১২. কবিতার কথা। জীবনানন্দ দাশ। পৃষ্ঠা - ৪৭

* স্মরণ রাখতে হবে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের ও সমর সেনের কবিতাগুলি।

* 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ এই কথাগুলি লিখেছেন। প্রসঙ্গত ঐ ভূমিকাতে আমরা আরো জেনেছি যে' এ-সব কবিতা' ধূসর পাণ্ডুলিপি' - পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

১৩. আমার কালের কয়েকজন কবি। জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ২৩

* বনলতা সেন, অরুনিমা সান্যাল, মৃণালিনী ঘোষাল প্রমুখ নারীরা নামপদবী সহ এসে ভিড় করেছে তাঁর কবিতায়।

* অবশ্য বুদ্ধদেব বসুও এক্ষেত্রে জীবনানন্দের মতই নারীদেহকে কাব্যে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে তা দেহের স্থূল পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি।

* মিশ্ররীতি বলতে শেকসপীয়র প্রবর্তিত গঠন - বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে পেত্রার্ক সাধিত রূপকলা নির্মাণ, এই উভয় প্রকারের যুগ্মতা বুঝিয়েছি। অর্থাৎ শেকসপীরীয় রীতির স্তবক গঠনে ৪ ৪ ৪ ২ ও প্রায় পেত্রার্কান মিলবিন্যাসে ক খ খ ক। ক গ গ ক ইত্যাদির সন্ধি বন্ধ প্রয়াস।

* এখানে অষ্টকের মিলের ক্ষেত্রে ক খ খ ক, ক খ খ ক। এবং ষটকে চতুর্থ, চতুর্থ রীতি অনুসৃত।